গ্রাফিক ডিজাইনে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে গ্র্যাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ ইসরাফিল প্রাং*

সারসংক্ষেপ : *মানবসভ্যতা বিনির্মাণে শিক্ষা অপরিহার্য একটি মৌলিক উপাদান। যুগের চাহিদা বিবেচনায় শিক্ষার গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন ধারা-উপধারায় বিভক্ত হয়ে প্রসারিত হয়েছে। শিল্পশিক্ষা সেই ধারাবাহিকতার একটি অতি প্রয়োজনীয় একটি ধারা। চিত্রকলাকে বলা হয় মানুষের প্রথম দৃশ্যগত ভাষা। দৃশ্যগত ভাষা বা এই শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সৃজনশীল এই শিক্ষাক্ষেত্রটি নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। গ্রাফিক ডিজাইন তারই একটি অন্যতম অংশ, যা অতি প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বিষয়। প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বব্যবস্থায় গ্রাফিক ডিজাইনের আধুনিক প্রতিরূপ হলো (Visual Communication) দৃশ্যগত যোগাযোগের শিল্পকলা। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সমন্বয়ে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে যুগোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এখন অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে ১৬৫টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও বর্তমানে পাঁচটি সরকারি এবং তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পাশাপাশি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক কর্মক্ষেত্রে দক্ষ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রাফিক ডিজাইনারের চাহিদা অনেক। এর বিপরীতে আমাদের দেশে গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের এই গ্র্যাজুয়েটদের পদচারণা যথেষ্ট নয়। সংখ্যা সীমিত হলেও তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে সুনাম অক্ষুন্ন রেখে চলেছেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গ্র্যাজুয়েটদের সরব ও সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার পরিসর বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এর কর্মক্ষেত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনার নানান দিক অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করা হয়েছে।*

*সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা (Introduction)

মানবসভ্যতার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। শিল্পের ইতিহাসের সময়কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে বলা কঠিন। পৃথিবীর জন্ম ৪.৫৩৪ বিলিয়ন বছর হলেও আমরা জৈবিক সচেতনতা ও সচেতন মানবসভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজে পাই প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের মধ্য দিয়ে। আদিম উৎপত্তি থেকে সভ্য রাষ্ট্রের দিকে মানব প্রজাতির যাত্রা এবং মানুষের ভাগ্যের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা। প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যম হলো শব্দের প্রয়োগ। আদিম উৎপত্তি থেকে শুরু করে দীর্ঘ বিবর্তনীয় পথ ধরে কথা বলার সীমাবদ্ধতা থেকেই শব্দের উৎপত্তি। (Maggs, 1998 : 4)

মানুষের স্মৃতির ভ্রান্ততা/ভ্রষ্টতা কিংবা অভিব্যক্তির তাৎক্ষণিকতা যা-পরিকল্পনা, সময় বা স্থান অস্পষ্ট হয়ে সময়ের সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায়। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ চিন্তার অভিব্যক্তি স্থায়ীকরণের জন্যই পরবর্তীকালে শব্দ থেকে চিহ্ন ও চিত্রের প্রকাশ ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়। যার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় আদিম গুহাচিত্রে। ধারণা করা হয় ছবি আঁকা ও চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়াই মানুষের দৃশ্যমান প্রথম চাক্ষুষ যোগাযোগ ব্যবস্থা। আফ্রিকাতে পাওয়া প্রাথমিক মানুষের চিহ্নগুলো দুই লক্ষ বছরেরও বেশি পুরোনো। প্রারম্ভিক পালিওলিথিক থেকে নিওলিথিক সময়কালে (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০০ অব্দ-৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) গুহাচিত্রে চিহ্নগুলো রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রথম দিকে আফ্রিকান এবং ইউরোপিয়ানরা যেসব গুহায় চিত্রগুলো অঙ্কন করেছিল সেসবের মধ্যে স্পেনের আলতামিরা এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের লাসকাক্স গুহা উল্লেখযোগ্য (Maggs, 1998: 5)।

আদিম চিত্রগুলোতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের যে প্রাথমিক অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে তা কিন্তু শিল্প রচনার জন্য চিত্রিত হয়নি; দৃশ্যগত যোগাযোগের সূচনাপর্বে গুহাচিত্রগুলোতে উপজীব্য হয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার অনুষঙ্গ, উপযোগিতা এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি। চিত্রে বর্শা চিহ্নের উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় প্রাণীর উপর ক্ষমতা অর্জন ও শিকারে সফলতা অর্জনের জাদুকরী আচার। তার সাথে যুক্ত হয়েছে বিন্দু, বর্গক্ষেত্র, রেখা এবং বিভিন্ন আকারসহ বিমূর্ত জ্যামিতিক চিহ্ন। যা চিত্রে প্রাণীদের সাথে মিশে গিয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে মানুষের

সকল আকাঙ্ক্ষার। এভাবেই সমগ্র বিশ্ব তথা আফ্রিকা থেকে উত্তর আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা থেকে নিউজিল্যান্ডের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত চিত্রিত হয়েছে অসংখ্য পেট্রোগ্লিফ ও আইডিওগ্রাফ। যেগুলো পাথরে খোদাই বা আঁচড়ানো চিহ্ন বা সাধারণ চিত্র, যা মানুষের বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করা প্রতীক বা উচ্চতর পর্যবেক্ষণ এবং স্মৃতির প্রমাণ বলে মনে করা হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সের লরথেটের গুহায় পাওয়া খোদাই-করা Raindeer Antler (বলগা হরিণের শিং)। এখানে হরিণ ও সামনের আঁচড়যুক্ত রেখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো অভ্যন্তরীণ চিহ্নসহ দুটি হীরার ফম, যা প্রাথমিক প্রতীকের অবকাঠামো বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ধরনের চিত্র বা চিহ্নগুলোতে মূল চরিত্র বজায় থাকুক বা না থাকুক শেষ পর্যন্ত এটি আদিম মানুষের প্রাথমিক ভাষার দৃশ্যমান প্রতিরূপ হিসেবেই উদ্ভাসিত হয়েছে। (Maggs, 1998 : 5)

ভাষার দৃশ্যমান প্রতিরূপ হলো 'চিত্র'। আর এই চিত্র যখন মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও চাওয়া-পাওয়ার প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে চিত্রিত হয় তখনই তা শিল্পরূপ ধারণ করে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিল্প হাজারো শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হয়েছে। শিল্পশিক্ষার অনেক শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান থাকলেও বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে শিল্পশিক্ষায় গ্রাফিক ডিজাইন আজ একটি অন্যতম পাঠ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অথচ গ্রাফিক ডিজাইনের উচ্চশিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাংলাদেশে খুবই সীমিত বা যৎসামান্যই বলা চলে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক শিক্ষার্থীর মাঝে সুকুমার কলায় শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রসারিত হচ্ছে শিল্পবাজার। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিসংখ্যানের দিকে একটু চোখ ফেরালেই তা দেখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশে মোট ১৬৫টি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৩টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়) থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ রয়েছে (ইউজিসি ওয়েবসাইট : ২০২২)। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীকে গ্রাফিক ডিজাইনে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করলেও অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো সেভাবে গ্র্যাজুয়েশন

ডিগ্রি প্রদান করতে পারেনি। দুই-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর তিন-চারটি শিক্ষাবর্ষে হাতে গোনা কিছু শিক্ষার্থীকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো কোনো গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করতে পারেনি। পক্ষান্তরে দেশে হাতেগোনা চার-পাঁচটি আর্ট কলেজ থাকলেও সেসব কলেজে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে জ্ঞান চর্চার তেমন সুযোগ নেই বললেই চলে। কর্মক্ষেত্রের পরিধি এবং সম্ভাবনাময় বাস্তবতার কথা চিন্তা করলে এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

ঢাকার বর্তমান চারুকলা অনুষদে ১৯৪৮ সাল থেকে গ্রাফিক ডিজাইনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হলেও এর প্রসার ঘটে স্বাধীনতা-উত্তরকালে। শিল্পশিক্ষার চারণভূমিতে বেড়ে ওঠা শিল্পী কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন্নবী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান প্রমুখ দেশবরেণ্য শিল্পীর হাত ধরে আজকের গ্রাফিক ডিজাইনের উর্বর ভূমি সৃষ্টি হলেও গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে তাঁরা যতটা প্রতিষ্ঠিত, তার চেয়ে শতগুণে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন চিত্রশিল্পী সত্তায়। আবার গ্লোবাল কমিউনিকেশনে অতীতের অবদান এবং বর্তমানের সুশিক্ষিত গ্রাফিক ডিজাইনারদের সাফল্য সঠিক পন্থায় উপস্থাপিত হচ্ছে না বা উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় সক্ষমতার অভাব দেখা যায়। ফলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনের স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রতিষ্ঠা লাভ সেই অর্থে হয়নি। বিশ্ববাজারে ডিজাইনাররা যথাযথভাবে যুক্ত হতে পারছেন না বলেই আজ 'টপ টুয়েন্টি' বা 'টপ হান্ড্রেড ডিজাইনার ইন বাংলাদেশ'-এ চারুশিল্পে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত কোনো শিল্পীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ হিসেবে এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারছেন না বা এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। যদিও প্রতিনিয়তই সংকুচিত হচ্ছে দেশীয় কর্মসংস্থানের স্থিতিশীলতা। অথচ গ্রাফিক ডিজাইনে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ বর্তমানে দিনদিন বাড়ছে। শুধু যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষার সুযোগ না থাকার কারণে আগ্রহীরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছেন। অপরদিকে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের চাপে অনেক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ডিগ্রি অর্জনের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানহীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুই-

তিন মাস কম্পিউটার ট্রেনিং সম্পন্ন করে তথাকথিত গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার আপ্রাণ চেষ্টায় অবতীর্ণ হচ্ছেন।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Research)

গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্র, সক্ষমতা, সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা এবং সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য করণীয় নির্ধারণই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উচ্চতর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। দিনদিন সংকুচিত হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি কর্মক্ষেত্র। প্রতিদিন বাড়ছে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা। সীমিত সুযোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে যে হারে প্রতিবছর উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে, সে হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। বাড়ছে না প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগও। কর্মসংস্থানেরক্ষেত্রে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের যে দায়বদ্ধতা কমছে নাকি বাড়ছে? এ দুটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে রেখে বর্তমান বাস্তবতার আলোকে এ প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশে নিম্নল্লিখিত আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলনও গবেষণার মূল লক্ষ্য।

ক) গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন;

খ) শিল্পশিক্ষায় আগ্রহী শিল্পানুরাগীদের গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

গ) বৈশ্বিক চাহিদার বিপরীতে গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষায় পেশাগত সক্ষমতা অর্জন;

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রফেশনাল দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে সার্বিক মানব সম্পদ উন্নয়ন;

ঙ) বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষাপদ্ধতির সার্বিক উন্নয়ন।

পটভূমি (Background of the Study)

ঢাকা ১৬০৮ সালে বাংলার রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন মুর্শিদাবাদে। শতাব্দীকালীন সময়ে ঢাকায় মোঘল শিল্পকলার প্রভাব থাকলেও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প শিক্ষালয় গড়ে ওঠেনি।

বিভিন্ন জাতিসত্তার অধীনে ভারতবর্ষ শাসিত হলেও সর্বশেষ ১৮৫৮ সালে ইংরেজ দখলদারিত্বের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া বাণিজ্য ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনাতে ইউরোপীয় বণিকরা এ অঞ্চলে আসতে শুরু করে। কোম্পানি শাসনের শুরু থেকে অনেক ভাগ্যান্বেষী, গুণিজন, শিল্পীরা আসতে থাকেন। তাদের সংস্পর্শেই বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল তথা বঙ্গদেশ হয়ে ওঠে আধুনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। শিল্পী টিলি কেটলকে (১৭৬৯-১৮৫০) দিয়ে ভারতে প্রথম যাত্রা শুরু হয় ইউরোপীয় শিল্পীদের। ১৭৭০-১৮৫০ পর্যন্ত জোফানি (১৭৮৩-৮৯), আর্থার ডেভিড (১৭৮৫-৯৫), জন স্মার্ট (১৭৮৫-৯৫), ওজিয়াস হামফ্রি (১৭৮৫-৮৭), স্যামুয়েল অ্যান্ড্রুজ (১৭৯১-১৮০১), ডায়না হিল (১৭৮৬-১৮০৭), উইলিয়াম হজেস এর মতো গুণী শিল্পীদের আগমনে তৎকালীন শিল্পশৈলীর অনুপ্রেরণায় স্থানীয় যে শিল্পরীতি চালু হয়েছিল তা মুর্শিদাবাদ রীতি নামে পরিচিত। শিল্পকলাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণের প্রথম পরিকল্পনা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর (বিনোদবিহারী, ২০১৬ : ১০৮)। ইংরেজ শিল্পীদের আগমনে সংমিশ্রিত শিল্পধারা রচিত হাওয়ায় দেশীয় কারিগর ও শিল্পীদের শিল্প তথা জীবনমুখী কারুশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। দ্বন্দ্ব শুরু হয় সহজলভ্য শিল্পের সাথে।

১৮৫৪ সালের ১৬ই আগস্ট কোলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এই অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু হয়। ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন ইংরেজ শিক্ষক এইচ এইচ লক অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষ লক শিল্পশিক্ষাকে ফাইন আর্ট এবং অ্যাপ্লাইড আর্ট এই দুই ভাগে ভাগ করে তিনি পাশ্চাত্য আদর্শ ও উপকরণে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। প্রথমে মাত্র ১৩ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে এই শিক্ষা যাত্রা শুরু করে। তাঁর মৃত্যুর পর এম. শুয়ামবার্গ, ও. গিলহার্ডি ও ডব্লু.এইচ. জবিনস এর মতো

অধ্যক্ষের হাতে শিল্পশিক্ষার সামান্য পরিবর্তন হলেও আর্টস্কুলের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আসে অধ্যক্ষ ই.বি. হ্যাভেল-এর হাত ধরে। তিনিই প্রথম স্থানীয় কুটির শিল্পের সাথে দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাস করেন স্থানীয় শিল্পের জাগরণ ছাড়া বৃহত্তর শিল্প বিকাশ সম্ভব নয়। হ্যাভেলের পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষা কিছুটা সংকুচিত হলেও ফ্রেস্কোর মতো বিষয়ের পাশাপাশি চালু করেন প্রাচ্যদেশিয় রীতি, ডিজাইন ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে বিক্ষুব্ধ তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রণদাশগুপ্তের নেতৃত্বে পুরোনো আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয় জুবলি আর্ট স্কুল। ই.বি হ্যাভেল তার শিল্পযুদ্ধে পাশে পান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে অসুস্থতাজনিত কারণে হ্যাভেল ভারত ত্যাগ করার আগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ই.বি হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নতুন শিক্ষানীতি 'বেঙ্গল স্কুল' বেঙ্গল শিল্পধারা নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষের ক্রমধারায় অবিভক্ত বাংলার পূর্বাংশ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে শিল্পচর্চার পটভূমি তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার যাত্রা শুরু ১৯৪৮ সালে। যার নেতৃত্বে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। এমন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সকল মহলে প্রচারিত হলেও প্রথম শিল্পচর্চার ক্ষেত্রভূমি রচিত হয় খুলনার মহেশ্বরপাশায় ১৯০৪ সালে। খুলনার দৌলতপুর থানার মহেশ্বরপাশা গ্রামের শশীভূষণ পাল 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট' নামে নিজ বাড়িতে গোলপাতার ঘরে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম এই স্কুলের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে ১৯১৮ সালে তৎকালীন গভর্নমেন্ট আর জেলা বোর্ড থেকে স্কুলের নামে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি আরও স্থায়ী ও নিয়মিত হয়। মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলের প্যাডে ১৪.০৩.১৯৭৫ তারিখে জয়নুল আবেদিন উল্লেখ করেন, 'যুক্ত বাংলাদেশে কোলকাতা আর্ট কলেজের পরে একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান'। একই তারিখে স্বাক্ষরিত ড. নীলিমা ইব্রাহিম মন্তব্য লেখেন, ''বাংলাদেশে এটি প্রাচীনতম চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এই বিদ্যালয়টিকে টিকিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন।''(নজরুল, ১৯৮৮ : ২২)

দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলেও শিল্পী শশীভূষণ পাল শৈশব থেকেই শিল্পসাধনায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। কোলকাতা কেন্দ্রিক শিল্পচর্চার বলয়ে শশীভূষণ যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর যোগ্য আসন পাননি। এর কারণ প্রান্তিকের প্রতি কেন্দ্রের উপেক্ষা। খুলনার একজন শিল্পী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী কোলকাতায় যে শিল্প বলয় তৈরি হয়েছিল তাতে গৃহীত হননি। শশীভূষণের নাম বাংলাদেশের ইতিহাসের সাংস্কৃতিক অধ্যায়ে তেমনভাবে উল্লেখিত নয়। কারণ ইতিহাসবেত্তারাও মহাসড়ক ধরে চলেন, ভুলে যান তারা আলপথ ধরে পল্লিগ্রামের শিল্পসৃষ্টির তাৎপর্য উপলব্ধির কথা। (মইনুদ্দীন, ২০২১ : ৬৪)

শিল্পী শশীভূষণ পাল নিজ গ্রামে প্রথমে গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নান্দনিক শিল্পবোধ জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে কর্মসংস্থানে তাদের যোগ্য করে তৈরি করাই ছিল তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য (শেখ সাদী, ২০২১ : ১০)। যুক্ত বাংলায় এটি চতুর্থতম শিল্পশিক্ষালয়। ১৮৩৯ সালে মেকানিক্স ইনস্টিটিউট পরে ১৮৫৪ সালে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, ১৮৬৫ সালে সরকারিকরণে 'গভার্ণমেন্ট স্কুল অফ আর্ট' নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে প্রতিবাদী শিল্প শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের পটভূমিতে ১৮৯৭ সালে রণদাশগুপ্তের নেতৃত্বে 'দা জুবলি আর্ট একাডেমি' প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার পটভূমি রচিত হয়। মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় চারুকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলাভবন।

জয়নুল আবেদিন যখন শৈশবে, শশীভূষণ পাল তখন শিল্প খ্যাতির শীর্ষে। উপনিবেশিক আমলে তিনিই একমাত্র শিল্পচর্চায় অবদানের জন্য 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর খ্যাতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজন্যবর্গের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। শশীভূষণ ও জয়নুলের শিল্প আন্দোলন এই উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন। শশীভূষণের শিল্পী খ্যাতি অর্জিত হয় ব্রিটিশ কলোনিয়াল পৃষ্ঠপোষকতায় আর জয়নুলের খ্যাতি আসে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশি চেতনা জাগ্রত হয়। শশীভূষণ পাল ও জয়নুল আবেদিন পূর্ববঙ্গের দুই পথিকৃৎ শিল্পী। বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং লালনই তাঁদের মৌলিক শিল্পাদর্শ। শশীভূষণ পালের জীবদ্দশায় আর্ট স্কুলটি

তাঁর পরিবারের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর ছাত্র সুরেন্দ্রনাথের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ভারতে চলে যান। তারপর থেকে কার্যত স্কুলটি বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ধাবিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। স্বাধীনতা-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী শিল্পকলা বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের চেয়ে বৈষয়িক বিষয়াদির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ফলে তৎকালীন কোলকাতা আর্ট স্কুলের যাবতীয় বিষয়াদির তালিকা আর্ট স্কুলের শিক্ষক জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ ও কামরুল হাসানের হাতে হলেও তারা ঢাকায় খালি হাতেই ফিরে এসেছিলেন। ঢাকায় ফিরে তাঁরা তাঁদের যোগ্য পেশা নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অবশেষে বাধ্য হয়েই জয়নুল আবেদিন ও আনোয়ারুল হক ঢাকায় সাধারণ স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হন। শফিকুল আমিন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে, সফিউদ্দীন আহমেদ কলেজিয়েট স্কুলে আর হাবিবুর রহমান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগ দেন। এভাবেই বয়সে তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীবৃন্দ বিশেষ করে জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান তৎকালীন বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, উৎসাহী সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় ঢাকায় ১৯৪৮ সালে 'গভর্ণমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট' নামে আর্টস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। (বুলবন, ১৯৭৮ : ৯)। এই পর্বে শিল্পশিক্ষাকে 'ফাইন আর্ট' এবং 'কমার্শিয়াল আর্ট' নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা হয়।

১৯৪৮ সালে চারুকলা প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৩-৫৬-এর মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রতিভাধর শিল্পী বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরাই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে অগ্রদূত হিসেবে পরিচিতি পান। এদের মধ্যে সৈয়দ শফিকুল হোসেন, হামিদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুর রউফ, আব্দুল বাসেত, রশীদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, আবু তাহের ও মীর মুস্তাফা আলী অন্যতম। (বুলবন, ১৯৭৮ : ১২)। ১৯৫৮ পর্যন্ত গোটা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে একটা প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন বিরাজ করছিল। এর আগে বেশ কিছু শিল্পী শিক্ষক আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে

শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। যেমন–মোহাম্মদ কিবরিয়া ও সফিউদ্দীন আহমেদ ছাপচিত্রে, আব্দুর রাজ্জাক ভাস্কর্যে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সেসব বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ফলশ্রুতিতে গ্রাফিক্স (ছাপচিত্র, ১৯৫২), প্রাচ্যকলা (১৯৫৫), মৃৎশিল্প (১৯৬১), ভাস্কর্য (১৯৬৫), কারুশিল্প (১৯৬৭)-র মতো নতুন নতুন বিভাগের সৃষ্টি হয়। (বুলবন, ১৯৭৮ : ১৩)।

১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ঢাকা'কে বাংলাদেশের রাজধানী করা হলে দেশের সার্বিক শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে খুলনায় 'খুলনা আর্ট কলেজ' নামে শিল্পশিক্ষা পুনরুজ্জীবিত হয়। পরবর্তীকালে 'রাজশাহী আর্ট কলেজ' এবং পরে 'চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্পকলায় উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন গতিপথ সৃষ্টি হয়।

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

উক্ত গবেষণাপত্রটি মিশ্র পদ্ধতিতে-সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং গুণবাচক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। গবেষণাপত্রটি সাক্ষাৎকার, জরিপ, পর্যবেক্ষণ এবং দ্বৈতয়িক বা সেকেন্ডারি উৎসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন জার্নাল, বই, ওয়েবসাইট এবং অভিসন্দর্ভকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ থেকে ২০০১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পাশ করা ৪৫০ জন গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে ৯৩ জন গ্র্যাজুয়েটকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্ত-মারিয়ম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি এবং ইউডা বিশ্ববিদ্যালয়। এসব গ্র্যাজুয়েটের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রশ্নমালা প্রদানের মাধ্যমে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

'গ্রাফিক ডিজাইন' কী? তা নিয়ে আলোচনা করার শুরুতেই 'শিল্প' সম্পর্কে আলোচনা জরুরি। কেননা মোটাদাগে শিল্প বলতে যা বোঝায় তার সাথে গ্রাফিক ডিজাইনের তাত্ত্বিক মেলবন্ধন প্রয়োজন।

শিল্প (Art)

'Art' শব্দটি শুনলেই সাধারণত সবার চোখে ভেসে ওঠে বিশ্বখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি 'মোনালিসা', 'গুয়ের্নিকা', 'দি পার্সিসটেন্স অব মেমোরি', 'দি ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম', 'সানফ্লাওয়ার', 'লাস্টসাপার'-এর মতো বিশ্বনন্দিত কিছু চিত্রকর্মের প্রতিচ্ছবি। অথবা আত্মপ্রকৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের চিত্রমালা। যেমন–প্রতিকৃতি, গ্রামের দৃশ্য, নদী-নৌকার দৃশ্য ইত্যাদি।

শিল্প কীভাবে গঠিত হয় তার কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা নেই। শিল্পের ব্যাখ্যা ইতিহাস এবং সংস্কৃতি জুড়ে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে 'Art'-এর প্রাথমিক ধারণাটি পুরোনো একটি ল্যাটিন অর্থের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যা অনুবাদ করলে মোটামুটিভাবে অর্থ দাঁড়ায় 'দক্ষতা' বা 'নৈপুণ্য'। যেটি 'কারিগর' শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেকোনো বিষয়ের উপর দক্ষতাকেই শিল্প বলা হতো।

খ্যাতিমান রুশ লেখক লিও টলস্টয়ের মতে "মানুষের সকল সৃষ্টিই শিল্প।"

মোটাদাগে শিল্পকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়–১) ফাইন আর্ট বা চারুশিল্প, ২) অ্যাপ্লাইড আর্ট বা ব্যবহারিক শিল্প।

১) ফাইন আর্ট বা চারুশিল্প :

যে শিল্প শুধু মনের ক্ষুধা মেটায় অথচ আমাদের প্রাত্যহিক বা ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষ কোনো কাজে আসে না এমন শিল্প ফাইন আর্ট বা চারুশিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষ যখন তার মনের সৌন্দর্য বা অভিব্যক্তির উপস্থাপন/দৃশ্যমান করে থাকে তখন মানবমনে আত্মতৃপ্তি, সুখ-দুঃখের আত্মব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। আর

এই আপেক্ষিক পরিপূর্ণতাই হলো ফাইন আর্টের মূল কার্যকারিতা। যেমন–পেইন্টিং, ভাস্কর্য, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব না রাখলেও প্রশান্তি, দুঃখ-ব্যথা, স্মৃতি-বিস্মৃতি ইত্যাদি আবেগে আপ্লুত করে তোলে।

২) অ্যাপ্লাইড আর্ট বা ব্যবহারিক শিল্প :

প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন সকল শিল্প হলো 'অ্যাপ্লাইড আর্ট' বা ব্যবহারিক শিল্প। এই শিল্প সৃষ্টি হয় মূলত ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে। অর্থাৎ ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং গ্রাহক/অংশীদারদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে এ শিল্পের প্রধান প্রেক্ষাপট রচিত হয়। যেখানে সমাজ-সামাজিকতা, শ্রেণি-পেশা, সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা গ্রাহক ও দর্শকের রুচি-অরুচি, চাহিদা, তৃপ্তি বিবেচনায় রেখে নান্দনিক সৌন্দর্য আরওপিত হয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, ফাইন আর্ট ব্যতীত পৃথিবীর তাবৎ শিল্পই অ্যাপ্লাইড আর্টের অন্তর্গত। গ্রাফিক ডিজাইন সকল শিল্পধারার অন্যতম একটি প্রবাহ। ব্যবহার উপযোগিতার ধরনভেদে এ শিল্পকে হাজারো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন–কারুশিল্প, দারুশিল্প, তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতবশিল্প, কাচশিল্প, চিকিৎসাশিল্প, সামরিকশিল্প ইত্যাদি।

গ্রাফিক ডিজাইন (Graphic Design)

'গ্রাফিক ডিজাইন'-এর আভিধানিক অর্থ 'চিত্র সম্পর্কিত নকশা'। এক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইন-এর উপযোগিতা সহজে উপলব্ধিতে আসে না। গ্রাফিক ডিজাইন-এর অন্তর্গত ব্যাখ্যা বহুমুখীনতায় প্রসারিত যা সমাজে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে। আধুনিক সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত আপামর জনগণ এমন কেউ নেই যে গ্রাফিক ডিজাইন শব্দটির সাথে পরিচিত নয়। যদিও কখনো কখনো গ্রাফিক আর গ্রাফিক্স শব্দটি ওলটপালট হয়ে যায়, তারপরও গ্রাফিক ডিজাইনে আপেক্ষিক অভিব্যাপ্তি অভিন্নই থেকে যায়। ডিজাইন হলো মানবমনের সুনির্দিষ্ট কল্পনার দৃশ্যমান প্রতিরূপ। আর গ্রাফিক ডিজাইন হলো এমন-সব ডিজাইন যা সমাজে প্রতিটি স্তরে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ছাপা পদ্ধতি উদ্ভাবনের

পর থেকে যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই সমাজে গ্রাফিক ডিজাইনের নিত্য প্রয়োজনীয়তার ব্যাপকতা শুরু হয়। জনগণের সঙ্গে জনগণ, জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তথ্য-নির্দেশনা, প্রচার, প্রকাশনা, যোগাযোগসহ সকল কাজেই গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যবহার সুস্পষ্ট। গ্রাফিক ডিজাইনের প্রধান অনুষঙ্গ হলো 'আইডিয়া', 'ইমেজ' এবং 'টেক্সট'। প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান সময়ে গ্রাফিক ডিজাইনের আধুনিক প্রতিরূপ হলো Visual Communication বা দৃশ্যগত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

'গ্রাফিক' কথাটি ড্রইং, ডিজাইন ও প্রতিচিত্র সম্পর্কিত। কোনো বস্তু, বিষয় বা আইডিয়ার শৈল্পিক দৃশ্যমান কল্পনাকে নকশা বা ডিজাইন বলা হয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য, পরিচয়, বার্তা, নির্দেশনা বা আইডিয়া দর্শক-গ্রাহকের কাছে আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য নান্দনিক দৃষ্টিনির্ভর ভাষা অনেক বেশি কার্যকর। এক্ষেত্রে ভাষা নির্মাণে টাইপোগ্রাফি ও ইমেজ প্রধান দুটি উপাদান। তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার-যেভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করছে, অডিও ভিজুয়াল প্রযুক্তি এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সহায়ক। এই ভিজুয়াল কমিউনিকেশনের কার্যকর ও নান্দনিক মাধ্যমটিই হলো গ্রাফিক ডিজাইন।(মাকসুদুর : ২০১৪)

গ্র্যাজুয়েট (Graduate)

গ্র্যাজুয়েট বলতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রফিক ডিজাইন বিষয়ে স্নাতক ডিগিপ্রাপ্তদের বোঝানো হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ (Observation and Analysis)

প্রত্যেক গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের কাছেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অসীম। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের প্রযুক্তি যেভাবে দ্রুত গতিময়তায় ধাবিত হচ্ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অগ্রসর হতে পারছে না। বৈশ্বিক কর্মক্ষেত্রে বা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় যে পরিমাণ শিক্ষিত গ্রাফিক ডিজাইনার প্রয়োজন সে পরিমাণ সক্ষম, দক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রাফিক ডিজাইনার তৈরি করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটানো যাচ্ছে না। অথবা রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা এর গুরুত্ব বিবেচনায় আনছেন না।

অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটদের ধারণা আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পূর্বে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম এখনো সেখানেই আছি। অপরদিকে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ বিশ্ব পুরোপুরি গ্রাফিক ডিজাইনের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে এই বোধের অভাবজনীত কারণে অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে আধুনিক বিশ্ব থেকে। তারপরও অনেকের অভিমত কিছুটা হলেও গ্রাফিক ডিজাইনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত নান্দনিক শিল্পবোধ ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই তারা টিকে আছে। আবার কারো কারো ধারণা গ্রাফিক ডিজাইনে দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা, শিল্পবোধ ও নিরলস জ্ঞানচর্চা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বাস্তবতার আলোকে নিরেদেরকে সমসাময়িক পর্যায়ে উন্নীত করার গভীর অনুশীলন।

শুধু ব্যবহারিক শিক্ষা কিংবা সফটওয়্যারের দক্ষতাভিত্তিক গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ডিজাইনার হিসেবে গড়ে তোলে না। অন্য সব বিষয়ের মতোই গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রেও রয়েছে কিছু মৌলিক ও তাত্ত্বিক বিষয়, যা সময়ের সাথে সাথে অগ্রসর হচ্ছে তেমনি হচ্ছে আধুনিক। ফলে এতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন নীতি ও তত্ত্ব যোগ হচ্ছে। গ্রাফিক ডিজাইনের এই মূল বিষয় জানা ও শেখার জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন। এমন মতের সাথে অনেকেই একমত প্রকাশ করে বর্তমান শিক্ষা পরিধি বাড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ, শিল্পমান সম্পন্ন গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই।

স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ না জেনে যথার্থ শব্দ গঠন বা লেখা সম্ভব হয় না, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলে গ্রাফিক ডিজাইনারও হওয়া যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত একজন ডিজাইনারের ভিত্তি তৈরি করে থাকে। ডিজাইনারের শিল্পবোধ আর দক্ষতার সংমিশ্রণে ডিজাইনের মানও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কারণ বাংলাদেশে উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্র দুটোরই অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে উদার মনমানসিকতারও। কারণ কর্মক্ষেত্রগুলোর কর্তাব্যক্তিগণ স্বল্প পারিশ্রমিকে সকল বিষয়ে পারদর্শী ডিজাইনার প্রত্যাশা করেন। আর তাই তাদের

কাজের শিল্পমানের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এগুলো তুলনামূলকভাবে মানহীন বিবেচিত হয়। গ্রাফিক ডিজাইন শিল্প বর্তমান ইন্টারেক্টিভ যুগে বিশাল অবদান রেখে চলেছে। দিনদিন যেভাবে প্রযুক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার ও উৎকর্ষতা সাধিত হচ্ছে তাতে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিল্পশিক্ষার পরিসর বিস্তৃত হচ্ছে না। প্রযুক্তিনির্ভর পাঠক্রম শিল্প-শিক্ষার্থীদের নাগালে না আনতে পারলে বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইন গুরুত্ব হারাবে। বিশ্বব্যাপী এই শিল্প ভাষা ও আবেদন অত্যন্ত শক্তিশালী। যা কমিউনিকেশনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ইতোমধ্যেই বিবেচিত। উন্নত অথচ দ্রুত পরিবর্তনশীল এই কর্মমূখী শিল্প যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এ শিল্প কোথায়, কিংবা কোনো চূড়ায় পৌঁছাবে তা কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদেরও উচিত এই একই পরিমণ্ডলে অবস্থান করা। কারণ বিশ্বজগতের সদা পরিবর্তনশীল ডিজাইন সেক্টরের অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যাচ্ছে। আর এজন্য রাষ্ট্রায়ত্ব কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় অদক্ষতা বা সাধারণ দক্ষতার বিশেষ গুরুত্ব। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনে সৃজনশীলতা, নান্দনিকতা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট ক্যারিকুলামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তিগত সুবিধা ও সমসাময়িক সুদক্ষ শিক্ষকের অভাবে যেটুকু হাতেকলমে শিক্ষা শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কিছুটা সুযোগ তৈরি হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। এ কারণে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যুগোপযোগী দক্ষ তারুণ্যনির্ভর দেশি-বিদেশি শিক্ষক ও প্রশিক্ষক এখন সময়ের দাবি।

চারুকলার নানা শাখা-প্রাশাখা থাকলেও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের এই যুগে পেশা হিসেবে গ্রাফিক ডিজাইন চাহিদাসম্পন্ন সম্মানজনক পেশা। এমন কোনো সেক্টর পৃথিবীতে নেই যেখানে গ্রাফিক ডিজাইন অনুপস্থিত। দিনের শুরু থেকে রাত অবধি অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় এর প্রায়োগিক পটভূমি, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সমান। ফলে গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের সরাসরি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ডিজাইন শিক্ষা যা অন্য সব অপেশাদার বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় যারা আগ্রহ প্রকাশ করছে তারা

অধিকাংশই শৈশব থেকেই শিল্পের প্রতি অনুরক্ত থাকে। যদিও অনেকেই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পায় না। চাহিদার বিপরীতে উচ্চতর শিক্ষার পরিসর নগণ্য বলেই প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অগণিত আগ্রহী শিল্পী। তাই প্রায় সকল গ্র্যাজুয়েটের মন্তব্য-উন্নত ও রুচিসম্মত কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিল্পশিক্ষার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিটি শিশুর সুকুমার বৃত্তিকে অনুপ্রাণিত করার বা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করাও জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা দেখি তার বিপরীত চিত্র। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় চারুকলাকে আবশ্যিক বিষয় থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আর বিসিএস ক্যাডার হবার স্বপ্নে বিভোর লাখ লাখ জিপিএ ৫.০০ পাওয়া শিক্ষার্থী সমাজে ঘুরছে জীবনের অজানা গন্তব্যের সন্ধানে। এক্ষেত্রে চাইলেই চারুকলাসহ অপরাপর সৃজনশীল ও প্রযুক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যুক্ত করা যেতে পারে। যেন সার্টিফিকেট-নির্ভর কর্মক্ষেত্রের বাইরে নিজের কর্মপরিধি নির্মাণ করতে ভূমিকা রাখে।

ফলাফল (Results)

প্রতিবন্ধকতা (Challenges)

দেশের গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা বাড়ছে। এর মূল কারণ আবার প্রযুক্তির সহজলভ্যতা। গ্রাফিক ডিজাইনে স্বল্প সময়ে অনেকেই কোর্স করে ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছেন। আর ওদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা গ্রাফিক ডিজাইনের সার্টিফিকেট বিক্রি করে বাজার নষ্ট করছেন। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের ডিজাইনাররা কম পারিশ্রমিকে কাজ করে বাজারে শিল্পবোধসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট গ্রাফিক ডিজাইনারদের চাহিদা নষ্ট করে চলেছেন।

গ্রাফিক ডিজাইনের মতো সৃজনশীল বিষয়ের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, নিয়োগকর্তাদের অজ্ঞতা বা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ শিল্পবোধের অভাব। একজন গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা জীবন শেষ করে কোনো একটি কর্পোরেট কোম্পানিতে ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে মালিক/উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ড ম্যানেজার সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার একজন ব্যক্তি। যিনি ডিজাইনের ধরন ও শিল্পমান বিবেচনা করেন নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের ভিত্তিতে। নান্দনিক শিল্পবোধ, ব্র্যান্ডের ভ্যালু, পরিবেশ-পারিপার্শিকতা সেখানে উপস্থিত থাক বা না থাক তাতে তার কিছু আসে-যায় না। এক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স তৈরি হয়। যা ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের ডিজাইনে বা সৃজনশীল কর্ম সম্পাদনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গতানুগতিক ডিজাইন ট্রেন্ডের বাইরে গিয়ে ডিজাইন করতে না পারার কারণে স্বতন্ত্র বা ট্রেন্ডের ডিজাইন গড়ে ওঠে না। কারণ ডিজাইনকে শুধু একটি ইমেজ, ভিডিও বা চিত্র হিসেবে গণ্য করে এর পেছনের আইডিয়া, সক্ষমতা, মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমকে গুরুত্ব না দেয়া এবং ডিজাইনারদের সৃজনশীল ব্যক্তি না ভেবে একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে মূল্যায়ন করা। তাছাড়া নিয়োগকারী সংস্থাগুলো গ্রাফিক ডিজাইনে দক্ষ একজন গ্র্যাজুয়েট এবং একজন সাধারণ কোর্স সম্পন্ন করা ডিজাইনারের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারাও এর অন্যতম কারণ। গতানুগতিক ডিজাইন তৈরির আরও একটি কারণ হচ্ছে-নিয়োগকর্তা কর্তৃক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময় তাদের গতানুগতিক চিন্তা চাপিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতা প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়।

গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্র নির্মাণে শুধু নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠান বা করপোরেট কোম্পানিকে দায় চাপিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষালয় ব্যর্থতা এড়াতে পারে না। বাংলাদেশের সংকুচিত শিল্পশিক্ষার পরিসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগসহ যেটুকুই প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ আছে তা আবার সময়োপযোগী কি না তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটগণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে গুরুত্ব আরওপ করেছেন। তবে কিছু কিছু গ্র্যাজুয়েট মনে করেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে যে নান্দনিক শিল্পবোধ

অর্জিত হয়েছে তা নিজেদের কর্মক্ষেত্র নির্মাণে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। কর্মক্ষেত্রের ধরনভেদে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা বা আগ্রহ তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

২০০১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ যে তিন-চারটি বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চতর প্রতিষ্ঠান গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করেছে তার সংখ্যা চাহিদার তুলনায় নগণ্য। এর মধ্যে ৯৩ জন গ্র্যাজুয়েটের অনলাইন সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ডিজাইনার না পাবার ক্ষেত্রে নিম্নেল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে–

- গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে মানসম্পন্ন উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা;
- গ্র্যাজুয়েটদের মার্কেট উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য পাঠক্রম প্রতিনিয়ত যুগোপযোগী না করা;
- গ্র্যাজুয়েটদের পেশাদারি মনোভাবের অনুপস্থিতি ও যথাযথ ওয়ার্ক প্লেসের অভাব;
- আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা ও সাবলীল উপস্থাপনায় জড়তা;
- সমকালীন পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে গ্র্যাজুয়েটদের সমন্বয়ের অভাব;
- জাতীয় শিক্ষাক্রমে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চারুকলা শিক্ষাকে নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন;
- শিল্পজ্ঞানহীন ভোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া;
- আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস বা শিল্পবাজার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাব;
- বাজার, ভোক্তার চাহিদা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা বা তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাব;
- অপেশাদার এবং সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিল্পবোধহীন ডিজাইন-কর্মীদের সহজলভ্যতা;
- সক্ষমতা অনুযায়ী নিজেদের যথাযথ পোর্টফোলিও নির্মাণে অনীহা;

- অ্যাকাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত শিল্পকর্ম শিল্পমানসম্মত কি না তা যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক পরামর্শ না দেওয়া।

সম্ভাবনা (Prospects)

'চারুকলা' শব্দটি উচ্চারিত হলেই সমাজে একটি ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর তা হচ্ছে–ছবি আঁকাআঁকির এক মহাউৎসব। যারা চারুকলায় ভর্তি হবার স্বপ্ন দেখে বা আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের অধিকাংশই ছবি আঁকবে ভেবে মনের অজান্তেই স্বপ্ন বুনতে থাকে। শিল্পালোকের সেই স্বপ্নবিলাস থেকেই উৎসারিত হয় জীবনের বাস্তবতা। বাংলাদেশের চারুশিল্পশিক্ষায় যে কয়টি ধারা বা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয় তার মধ্যে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়টি বর্তমান বাস্তবতায় প্রধানতম জীবননির্ভর শিল্পশিক্ষা। এ শিল্পধারায় শিক্ষিত একজন শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে জীবন সাজাতে এবং আর্থিক সফলতা লাভ করতে পারেন। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর দুনিয়াতে একজন গ্রাফিক ডিজাইনার চাইলে শিল্পসৃষ্টির পাশাপাশি নিজেকে স্বনির্ভর করতে পারেন সহজেই। কারণ রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অবারিত হয়েছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্র। প্রয়োজন শুধু নিজের আত্মবিশ্বাস আর নিজেকে গ্রাফিক ডিজাইনের শিক্ষার সাথে সাথে প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বিশ্বজুড়ে উন্মুক্ত।

গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়টি এখন সবারই পরিচিত একটি পেশার নাম। জনবহুল এই বাংলাদেশে সরকারি চাকুরির সুযোগ অপ্রতুল। আর তাই আজ শিক্ষিত অথচ কর্মহীন জনগোষ্ঠী ঝুঁকে পড়ছে গ্রাফিক ডিজাইন নির্ভর পেশায়। চারপাশে চোখ ফেরালে সহজেই তা দৃশ্যমান। ফ্রিল্যান্সিং করার সুযোগ আছে বলে অনেকেই গ্রাফিক ডিজাইনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। একজন গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েট স্বাভাবিকভাবে ডিজাইনে অনেকের থেকে বেশি জ্ঞান রাখেন। তাদের এ জ্ঞান যদি আরও অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায় তবে গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের বাইরেও অনেকেই বিশ্ববাজারে ডিজাইনে বেশ ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারে। যা বাংলাদেশের ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ বড় একটা ভূমিকা রাখবে বলে আশা

করা যায়। গ্রাফিক ডিজাইন এমন এক শিল্পশিক্ষা যা রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেসরকারি এবং স্বকর্মসংস্থানে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

বর্তমানে গ্রাফিক ডিজাইনে দক্ষতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা সর্বব্যাপী বলে এর কর্মপরিধিও ব্যাপক। যেমন–সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিসহ ফ্রিল্যান্সিং, প্রোডাক্ট ডিজাইন, মার্কেটিং, পাবলিকেশন ডিজাইন, ব্র্যান্ডিং, পাবলিসিটি ডিজাইন, প্যাকেজিং, প্রিন্টিং প্রেস, ইভেন্ট ডিজাইন, সেট ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ফটোগ্রাফি, ইমেজ ম্যানিপুলেশন, ইন্টারেক্টিভ মিডিয়া ডিজাইন, টেক্সটাইল ডিজাইন, ফন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইউঅ্যাই/ইউএক্স ডিজাইন, ওয়েব ও অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন, গেইম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মোশন গ্রাফিক্স, 3D মডেলিং, কার্টুন অ্যানিমেশন, 2D & 3D ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন, ব্রডকাস্ট ডিজাইন, ফিল্ম প্রোডাকশন, ভিজুয়াল ইফেক্টস প্রডাকশন (VFX), OTT (over-the-top) প্লাটফর্ম, রেডিমেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, মোবাইল কোম্পানি, সংবাদপত্র, ফ্যাশন হাউজ, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, অলংকরণ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট করপোরেট কমিউনিকেশন, ভিজুয়াল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইত্যাদি।

সুপারিশ (Recommendations)

গ্রাফিক ডিজাইন যেহেতু সরাসরি ভোক্তা বা ক্লায়েন্টের মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনে নির্মিত হয়, তাই একজন ডিজাইনারকে ডিজাইনের মৌলিক নিয়ম অনুসরণে স্বতন্ত্র শিল্পবৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হয়। সেই সাথে উপজীব্য বিষয়কে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হয়। বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনে উচ্চতর শিক্ষায় গ্র্যাজুয়েটদের আত্মবিশ্বাস, কর্মক্ষেত্র, সক্ষমতা এবং সম্ভাবনা সৃষ্টিতে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা যেতে পারে–

- জাতীয় পর্যায়ে যুগোপযোগী মানসম্পন্ন উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষার প্রসার;
- শিক্ষকদের প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক ট্রেনিং, সভা-সেমিনারের সুযোগ সৃষ্টি;

- দক্ষ, বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক/খণ্ডকালীন শিক্ষক/চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি;
- গ্র্যাজুয়েটদের প্রযুক্তিনির্ভর বাজার-উপযোগী করে গড়ে তুলবার জন্য পাঠক্রম প্রতিনিয়ত আধুনিকায়ন করা;
- গ্র্যাজুয়েটদের পেশাদারী মনোভাব গঠনে গবেষণা জার্নাল, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার এবং ডিজাইন উৎসব আয়োজন;
- ইংরেজিসহ আন্তর্জাতিক দু-একটি ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা দূরীকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;
- শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে স্নাতক পর্যায়ে ইন্টার্নশিপ বা খণ্ডকালীন চাকুরি বাধ্যতামূলক করা;
- সমকালীন পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে গ্র্যাজুয়েটদের আগ্রহ বাড়াতে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট স্কিল অনুযায়ী ফ্রিল্যান্সিংয়ে উৎসাহিত করা;
- জাতীয় কর্মসংস্থানে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টির মাধ্যমে যথোপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করা;
- উচ্চতর গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজাইনের নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র বিবেচনায় রেখে প্রফেশনাল মাস্টার্স বা সংক্ষিপ্ত কোর্স অফার করা;
- আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস বা শিল্পবাজার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান প্রদান;
- আন্তর্জাতিক ডিজাইন সংস্থা, ফোরামের সাথে যুগপৎ কর্মসম্পাদন চুক্তি করা;
- বাজার, ভোক্তার চাহিদা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা বা তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদান।

উপসংহার (Conclusion)

'গ্রাফিক ডিজাইন' একটি সুপরিচিত শব্দ। যোগাযোগ বা কমিউনিকেশনের সঙ্গে রয়েছে যার গভীর সম্পর্ক। এই কমিউনিকেশন মূলত ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু

করে রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, জনগণের সঙ্গে কমিউনিকেশন সৃষ্টির ক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বর্তমান ডিজিটালাইজেশনের যুগে বাংলাদেশেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে 'গ্রাফিক ডিজাইন' শব্দটি অতিপরিচিত। গ্রাফিক ডিজাইন-এর কার্যকরণ, বিষয়বস্তু ও তার সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট নীতিমালা ও মৌলিক আদর্শ শিক্ষণীয় বলেই যুগ-যুগান্তর ধরে রচিত হয়েছে শিল্পশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পটভূমি। বর্তমান কমিউনিকেশনের যুগে অত্যাবশ্যকীয় জীবনমুখী ও সৃজনশীল সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রাফিক ডিজাইন গুরুত্বপূর্ণ। শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক ডিজাইনারগণ সর্বজনীনভাবে সমাদৃত। গ্রাফিক ডিজাইন তথা ডিজাইনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা প্রায়োগিক বাস্তবতার কারণেই আজ আলোকিত। এই বিবেচনায় জীবনমুখী শিক্ষার প্রয়োজনে গ্রাফিক ডিজাইনের মৌলিক জ্ঞানসমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষার প্রসার এখন সময়ের দাবি। এতে রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তি মালিকানায় যৌক্তিক কর্মসংস্থান বাড়বে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করবে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। বৈশ্বিক পরিসরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ব্যাপ্তি ঘটবে, সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে দৃশ্যমান অবদান রাখবে।

তথ্যসূত্র (References)

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (২০১৬)। চিত্রকথা। অরুণা প্রকাশনী, ঢাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ড কমিশন ওয়েবসাইট। http://www.ugc-universities.gov.bd/cbhe (প্রবেশ ২১শে মে ২০২২, ০২:২৭টার সময়)

বুলবন ওসমান, "বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়ন : সামাজিক পটপ্রেক্ষিত", এম আসাফউদ্দৌলা (সম্পা.) (১৯৭৮)। শিল্পকলা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মইনুদ্দীন খালেদ, "শিল্পী শশিভূষণ পাল", মো. শেখ সাদীর ভূঁইয়া (সম্পা.) (২০২১)। শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারকগ্রন্থ। ফাইন আর্ট স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (১৯৮৮)। শিল্পী শশিভূষণ পাল ও মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ)। চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোঃ মাকসুদুর রহমান (২০১৪)। বাংলাপিডিয়া। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। https://en.banglapedia.org/index.php?title=Graphic_Design (প্রবেশ ২৮শে মে ২০২২, ০২:২৭টার সময়)

Maggs, Philip B. (1998). A History of Graphic Design. John Wiley & Sons, Inc, New York.